ভূমিকা

অপমান, অবহেলা, ক্লেদ, গ্লানি আর বঞ্চনা সেইসঙ্গে নিদারুণ ক্ষুধাকে দমন করার তীব্র প্রচেষ্টা। দু-মুঠো ভাতের জন্য উদয়াস্ত কঠিন লড়াই। মানুষের বাঁচা মরার নিদারুণ সংগ্রাম। বাসে, ট্রেনে, রাস্তায়, স্টেশনে, ফুটপাতে, বস্তিতে, গ্রামে; প্রতিদিনের চলার পথে হৃদয়ের মণিকোঠায় জমতে থাকে কিছু ছবি। আধিপত্যবাদের দ্বারা মথিত; ভাষাহীন, মন্ত্রহীন, শিক্ষাহীন প্রান্তিকায়িত-ব্রাত্য-অন্তেবাসী নিম্নবর্গের মানুষের করুণ মুখচ্ছবি। রোজ রোজ দেখা এ ছবিগুলো যখন আত্মঅপরাধী মনকে মোচড় দেয়, প্রশ্ন করে? কিছু একটা করতে চাই। নিরবলম্ব কোনকিছু তো হয় না, একটা অবলম্বন চায়। সাহিত্য ভালো লাগে, বিশেষ করে উপন্যাস। কিন্তু 'ক্ষুধা' ভালোলাগার বিষয় হতে পারে না। তবে তার কারণ অন্বেষণ, গবেষণার বিষয় তো হতে পারে। বিনোদনের সাহিত্য নয়, সাহিত্য পাঠের বিলাসিতাও নয়, সমস্যা জর্জরিত অবহেলিত জীবনের সাহিত্য হবে বিষয়। সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত তত্ত্ব ও সময়। তাই অপাঙ্‌ক্তেয় অবহেলিত জীবনের সংকটকে বিশ্লেষণ করতে হল তত্ত্ব দিয়ে, সময় দিয়ে।

আমাদের উত্তর-বিশ্বায়ন নাগরিক সভ্যতায় 'ক্ষুধা' এখনও স্থায়ী সমাধানহীন একটা সমস্যা। এই একটি সমস্যাই কীভাবে বদলে গেছে কাল থেকে কালে, আর এই একটি সমস্যাই কীভাবে বদলে দিয়েছে সাহিত্যপাঠের প্রচলিত প্রকরণকে। কীভাবে তৈরি হয়েছে উপন্যাস-সাহিত্যে বিনোদনের বিপ্রতীপ পাঠ। বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে খুঁজে নিতে হয়েছে বিরুদ্ধ ভাবনার, বিপরীত চেতনার লেখকদের বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস। নির্বাচন করতে হয়েছে এমন একটি সময়কে, যখন বাতাসে বিপদের গন্ধ ঢের। তখনও বিদ্রোহ বিপণি খুলে ফেলেনি, সমস্যা আর ভোগবাদের বিনোদন এক হয়ে যায়নি। রাজনীতি যখন সকল মানুষকে তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করতে পারে বা সংকটকে সংক্রমণের মতোই নানা প্রশ্নে জর্জরিত করতে পারে। তখন একটা সামাজিক বদল আর সাহিত্যিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী তো হয়েই পড়ে। এমনই একটা সময়কে মাঝখানে রেখে বিভাজিত হয়েছে বিচার-বিশ্লেষণ, আলোচনা-সমালোচনার গতিপথটি।

এভাবেই একটা সময় একটি চেতনার বদল ঘটিয়ে নতুন আর একটি চেতনার জন্ম দিল, তাকে প্রসারিত করল আরও নতুন সম্ভাবনার পথে। তাই আজও ময়নাগুড়ি ও ভেনেজুয়েলার ক্ষুধা ভোগসর্বস্ব মানুষকেও চাবুক মেরে সচেতন করে তুলছে প্রতিনিয়ত। সময় আর সময়ের উপন্যাস, সাহিত্য ও সাহিত্যিকেরা সেই সচেতন করার দায়িত্বকে পালন করে চলেছেন প্রতি মুহূর্তে।

মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন—'আমি লেখক, আমি তো খাদানে কয়লা কাটব না, ক্ষেতমজুর হব না, ভূমিদাস হব না, জঙ্গল নিয়ে লড়ব না, কৃষিক্ষেত্রে নেমে সংগ্রাম করব না। তাই নিজের

অস্তিত্বের সমর্থন খুঁজতে আমি লিখি'। 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে প্রান্তবাসী মানুষ', এই বিষয় নিয়ে এম. ফিল.-এর কাজ করার সময়ই আবিষ্কার করেছিলাম আমি একজন গবেষক। তাই লেখকের ভাবনার সূত্রেই বলতে পারি 'নিজের অস্তিত্বের সমর্থন খুঁজতে' আমিও সেই গবেষণার কাজই করেছি। এম. ফিল.-র কাজ করার সময়ই মনে আশা জেগেছিল যদি সুযোগ ঘটে তাহলে এই বিষয়টিকেই ক্রমশ প্রসারিত করা যাবে। নিজের সমস্ত ভাবনাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আয়ত্তাধীন নয়, তাই অনেক লেখকের ভাবনাকে, ভাষাকে, চেতনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিজের অন্তর্নিহিত বেদনার উন্মোচন ঘটাতে হল।

একাজে আমার পথপ্রদর্শক আমার 'আচার্য' অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করেই পথ চলা, তিনিই প্রেরণা। তাঁর আশীর্বাচন প্রতিমুহূর্তে উজ্জীবিত করেছে আমাকে। এটুকু ঋণ স্বীকার, কারণ, এক্ষেত্রে ঋণ স্বীকারের কথা বলাই নিয়ম। তবে অনির্বচনীয় যে-অনুভূতির জগতে তিনি বিরাজ করেন, সে-উপলব্ধির জগৎ একান্তই আমার। সেখানে ধন্যবাদ দেবার, ঋণস্বীকারের কোনো ভাষা তৈরি হয়নি।

তবে ঋণ স্বীকার করব তাঁদের যাদের মধ্যস্থতায় আমার মস্তক আচার্যের করস্পর্শ পেয়েছে। সেই ডঃ আলাউদ্দিন মণ্ডল ও অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাব আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণকে আমাদের কাজে সহৃদয় সহযোগিতার জন্য। আলাদা করে বলব অধ্যাপিকা রামী চক্রবর্তীর কথা, শেষ মুহূর্তে তাঁর সহযোগিতা কোনোদিনও ভুলব না। আর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিকে, সমস্ত ক্লেদ, গ্লানি ভুলিয়ে দেবার জন্য। স্মরণ করি প্রয়াত শ্রদ্ধেয় পৃথ্বীশ সাহার অবদান, তিনি এখন ধন্যবাদের উর্ধ্বে। কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মীদের, আর লিটল ম্যাগাজিনের সন্দীপদাকে। তাঁদের সাহায্য ব্যতীত একাজ সম্ভব ছিল না। আর আছে জয়াদি ও বুকস স্পেস-এর কর্ণধার গিয়াসদা'র কথা। তাঁদের সহযোগিতা ভুলবার নয়। সবশেষে প্রণাম জানাই মা, বাবা, মামাকে। সর্বদা পাশে পেয়েছি যাদের।

বিনীতা

তারিখ :
কঙ্কাবতী, বাঁকুড়া, ৭২২১৪১

সম্পা মণ্ডল
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিলচর